রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে

المكتوبات

আল-মাকতুবাত

বদিউজ্জামান
সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন
SOZLER PUBLICATION

المكتوبات

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে
আল-মাকতুবাত
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

From The Risale-i Nur Collection
Al-Maktubat
Bediuzzaman Said Nursi

একাডেমিক গ্রুপ

Academic Group

প্রকাশকাল
মে ২০২২ খ্রীস্টাব্দ।

Published
May 2022

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস
মাসিক মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

Cover & Inner Design
Monthly Madina Graphics System
38/2, Bangla Bazar, Dhaka-1100

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন লিমিটেড
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় ফ্লোর)
বাংলাবাজার-১১০০ ঢাকা, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

Publisher
Sozler Publication
34 North brook Hall Road, Madrasa Market (2nd Floor)
Bangla Bazar-1100 Dhaka, Bangladesh
Mobile : 01767822064, 01676518987
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

মূল্য : ৭০০ (সাতশত) টাকা মাত্র।

Price : 700 (Seven Hundred) Tk Only.

m~PxcÎ

welq	c„ôv bs
প্রথম মাকতুব	৫
দ্বিতীয় মাকতুব	১৪
তৃতীয় মাকতুব	১৬
চতুর্থ মাকতুব	২০
পঞ্চম মাকতুব	২৩
ষষ্ঠ মাকতুব	২৫
সপ্তম মাকতুব	২৮
অষ্টম মাকতুব	৩১
নবম মাকতুব	৩৩
দশম মাকতুব	৩৮
এগারোতম মাকতুব	৪১
বারোতম মাকতুব	৪৪
তেরোতম মাকতুব	৪৯
চোদ্দোতম মাকতুব	৪৯
পনেরোতম মাকতুব	৫৪
ষোলোতম মাকতুব	৬৬
সতেরোতম মাকতুব	৮৪
আঠারোতম মাকতুব	৮৭
উনিশতম মাকতুব	৯৫
বিশতম মাকতুব	৯৭
একুশতম মাকতুব	২৭৯
বাইশতম মাকতুব	২৮২
তেইশতম মাকতুব	২৯৬
চব্বিশতম মাকতুব	৩০৩
পঁচিশতম মাকতুব	৩২৯
ছাব্বিশতম মাকতুব	৩৩০
সাতাশতম মাকতুব	৩৬৭
আঠাশতম মাকতুব	৩৬৮
উনত্রিশতম মাকতুব	৪১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

প্রথম মাকতুব

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

'চারটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর'

প্রথম প্রশ্ন : হজরত খিজির (আ.) কি জীবিত? আর তিনি যদি জীবিত থাকেন, তাহলে কেন অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর জীবিত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন?

উত্তর : তিনি জীবিত আছেন। তবে জীবন ও প্রাণের পাঁচটি স্তর রয়েছে। তিনি প্রাণের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন। এজন্যই অনেক ওলামায়ে কেরাম তাঁর জীবিত থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

প্রাণের প্রথম স্তর : এটা হলো আমাদের জীবন ও প্রাণ। আমাদের এই জীবন অনেক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

প্রাণের দ্বিতীয় স্তর : এটা হজরত খিজির (আ.) ও হজরত ইলিয়াস (আ.)-এর প্রাণের স্তর। এই স্তরের মধ্যে প্রাণের কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের দুজনের জন্য একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকা সম্ভব। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন। পানাহার করতে পারেন। তাঁরা আমাদের মতো সর্বদা মানবপ্রাণের প্রয়োজন ও অভাববোধে সীমাবদ্ধ নন এবং তাঁদের জন্য আবশ্যক নয়। অনেক আহলে কাশফ আওলিয়ায়ে কেরাম এই স্তরের লোকদের থেকে অনেক ঘটনা তাওয়াতুরের সাথে বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়ায়েতগুলো এই স্তরের প্রাণ ও জীবনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে এবং সুস্পষ্ট করে। এমনকি বেলায়াতের (অর্থাৎ, ওলিত্বের) স্তরের মধ্যে 'মাকামুল খিজির' নামে একটি স্তরও রয়েছে। সুতরাং যে ওলি এই স্তরে উন্নীত হন, তিনি হজরত খিজির (আ.)-এর সাথে উঠাবসা করেন এবং তাঁর থেকে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু কখনো কখনো এই ভুল ধারণা করা হয় যে, এই স্তরের লোক নিজেই খিজির (আ.)।

প্রাণের তৃতীয় স্তর : এটা হজরত ইদরিস (আ.) ও হজরত ঈসা (আ.)-এর স্তর। এই স্তরটি অনেক সূক্ষ্ম। মানবজীবনের প্রয়োজন ও অভাববোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ফেরেশতাদের প্রাণের অনুরূপ প্রাণের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করেন। তাঁরা দুনিয়াবি ও পার্থিব দেহসহকারে আসমানে বসবাস করেন। এই দেহ মিছালি দেহ (উপমা-দেহ)-এর কমনীয়তা ও সূক্ষ্মতা এবং নক্ষত্রীয় দেহের নূরানিয়াত ও উজ্জ্বলতা দ্বারা গঠিত। আর হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, হজরত ঈসা (আ.) শেষ জামানায় আবির্ভূত হবেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়ত মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। এই হাদিসের রহস্য হলো-

প্রকৃতি-দর্শনের প্রচলন অনুযায়ী তাতে শেষ জামানায় আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং নাস্তিকতার স্রোত ও ঢেউ থেকে খ্রিষ্টান ধর্ম পবিত্র এবং সকল অলীক কল্পকাহিনি থেকে মুক্ত। খ্রিষ্টান ধর্ম ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ায় কোনো কোনো আধ্যাত্মিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী আসমানীয় ওহির তরবারি কোষমুক্ত করে আধ্যাত্মিক

নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতা হত্যা করবে, যেমনিভাবে হজরত ঈসা (আ.)- যিনি ঈসায়ি ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি, তিনি জগতের নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিদার প্রতিনিধিত্বকারী দাজ্জালকে হত্যা করবে। অর্থাৎ, তিনি উলুহিয়াত তথা আল্লাহর প্রভুত্বের অস্বীকার করার চিন্তা-চেতনাকে হত্যা করবেন।

প্রাণের চতুর্থ স্তর : এটা শহিদগণের প্রাণ ও জীবন। কুরআনুল কারিমের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এটা প্রমাণিত। কবরজগতের মধ্যে মৃতদের প্রাণের সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত প্রাণের অধিকারী এই শুহাদায়ে কেরাম। হ্যাঁ, যেই শহিদগণ আল্লাহর পথে নিজেদের পার্থিব জীবনকে কুরবান করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বিশেষ রহমতে আলমে বারজাখে পার্থিব জীবনের সদৃশ একটি জীবন দান করেন। তবে সেই প্রাণ ও জীবনে কোনো ধরনের কষ্ট নেই, কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কারণ তারা জানেন না যে, তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। বরং তারা এটা বিশ্বাস করেন যে, তারা সর্বোত্তম জগতে সফর করেছেন। তাই তারা পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভ করেন এবং পরিপূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন। কারণ, তারা মৃত্যুর দ্বারা প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদের কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করেন না। যেমনিভাবে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিরা জানে যে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে; যদিও তাদের আত্মা চিরস্থায়ী। তাই আলমে বারজাখে তারা (সাধারণ মৃত ব্যক্তিরা) যেই সুখ ও আনন্দ উপভোগ করেন, তা শহিদগণের সুখ ও আনন্দ থেকে অনেক কম। এর উদাহরণ সামনে প্রদান করা হলো :

দুজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে, তারা জান্নাতের মতো সুন্দর একটি প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। একজন জানে যে, সে যা দেখছে তা শুধুই তার স্বপ্ন। তাই স্বপ্নে যা-ই সে লাভ করে- তা খুবই অপূর্ণাঙ্গ। কারণ, সে মনে মনে ভাবে যে, ঘুম ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথেই তার এই আনন্দ শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে আরেকজন এই বিশ্বাস করে না যে, এটা তার স্বপ্ন। তাই সে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ করে এবং প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে।

এভাবেই আলমে বারজাখে শহিদগণের প্রাণ ও জীবন অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের প্রাণ ও জীবন থেকে ভিন্ন হয়ে যায়।

শহিদগণের এই স্তরের প্রাণ ও জীবন লাভ করা এবং তারা এই বিশ্বাস করেন যে, তারা জীবিত। এটা অসংখ্য রেওয়ায়েত ও ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি শহিদগণের সরদার হজরত হামজা (রা.) সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করেছেন, যে তার নিকট আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং তাদের পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যদেরও তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। এগুলো এই স্তরের প্রাণ ও জীবনকে সমুজ্জ্বলভাবে সাব্যস্ত করে এবং সুপ্রমাণিত করে। আমার ক্ষেত্রেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে :

আমার ভাগ্নে 'উবায়েদ'। সে আমার একজন ছাত্রও। সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমারই সামনে আমার পরিবর্তে শহিদ হয়েছে। আমি একটি সত্য স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি তার কবরে প্রবেশ করলাম। তার কবরটি মাটির নিচে অবস্থিত ঘরের মতো। যদিও আমি তার থেকে তিন মাস দূরত্বের পথ পরিমাণ (একটি কারাগারে) বন্দি ছিলাম এবং আমি তার দাফনের জায়গা সম্পর্কেও জানতাম না। আমি তাঁকে শহিদগণের প্রাণের স্তরে দেখেছি; অথচ সে বিশ্বাস করত যে, আমি মৃত। সে উল্লেখ করেছে যে, সে আমার জন্য অনেক কেঁদেছে এবং সে মনে করে যে, সে জীবিত। তবে সে নিজের জন্য মাটির নিচে সুন্দর একটি ঘর বানিয়েছে- যাতে করে সে রুশ বাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা পেতে পারে।

-কিছু নিদর্শন ও শর্ত সহকারে- এই আনুষঙ্গিক স্বপ্ন আমাকে এতটাই আনন্দিত করেছে যে মনে হয় যেন

আমি উল্লিখিত হাকিকত ও বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

প্রাণের পঞ্চম স্তর : এটা কবরবাসীদের জন্য রুহানি ও আত্মিক প্রাণ ও জীবন।

হ্যাঁ, মৃত্যুর অর্থই হলো স্থান পরিবর্তন, রুহের মুক্তিলাভ এবং দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। মৃত্যুর অর্থ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়, অনস্তিত্ব হয়ে যাওয়া নয় এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়। অতএব, অসংখ্য ঘটনাবলিতে আওলিয়ায়ে কেরামের রুহ দৃশ্যমান হওয়া, আসহাবে কাশফের নিকট তাদের আবির্ভাব হওয়া; জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের সাথে সকল কবরবাসীর সম্পর্ক এবং আমাদেরকে তাদের অবস্থা মোতাবেক বিভিন্ন সংবাদ প্রদান করা... এই ধরনের অনেক দলিল প্রমাণ এই স্তরের প্রাণ ও জীবনকে সমুজ্জ্বলভাবে সাব্যস্ত করে এবং প্রমাণিত করে।

রুহ চিরস্থায়ী হওয়া সংক্রান্ত 'উনত্রিশতম কালিমা' প্রাণের এই স্তরকে অনেক অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

এই আয়াত এবং কুরআনুল কারিমে এই ধরনের মৃত্যুকে প্রাণের (حیاۃ) মতো মাখলুক (সৃষ্ট) মনে করে এবং এটাকেও আল্লাহর বিশেষ এক নেয়ামত হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, মৃত্যুর বাহ্যিক অর্থ তো হলো মুক্ত হওয়া, নিঃশেষ হওয়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া, প্রাণের বাতি নিভে যাওয়া এবং মৃত্যু সকল স্বাদকে ধ্বংসকারী। তাহলে কীভাবে মৃত্যু 'সৃষ্ট' হলো এবং 'নেয়ামত' হলো?

উত্তর : আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরের শেষে উল্লেখ করেছি যে, মৃত্যুর অর্থ বাস্তবিকভাবেই পার্থিব জীবনের দায়িত্ব সমাপ্ত করা এবং মুক্তিলাভ করা। মৃত্যু হলো স্থান পরিবর্তনের নাম এবং অস্তিত্বের স্থানান্তরের নাম। মৃত্যু হলো চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি দাওয়াতনামা ও ভূমিকা। কেননা, যেমনিভাবে দুনিয়ায় প্রাণ ও জীবন আসাটা আল্লাহর সৃষ্টি ও তাকদিরের মাধ্যমে হয়েছে তেমনিভাবে দুনিয়া থেকে যাওয়াটাও আল্লাহর সৃষ্টি, তাকদিরের সিদ্ধান্ত, হেকমত ও রহস্য এবং পরিচালনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কারণ সবচেয়ে সাধারণ সূক্ষ্মতম প্রাণের অধিকারী তথা উদ্ভিদের মৃত্যু সৃষ্টির চমৎকার ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনাকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে যা প্রাণের চাইতেও অনেক বেশি বড়ো ও সুবিন্যস্ত। সুতরাং বিভিন্ন ফল-ফলাদি ও চারা-বীজ ইত্যাদির মৃত্যু আমাদের নিকট বাহ্যিকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিলিন হয়ে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মনে হয়, আসলে এগুলোর মৃত্যুর অর্থ হলো- সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মিশ্রণ, নিপুণ ও পরিমিতভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন অণুকণার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গঠনদান ও আকৃতিদান। এই মৃত্যু দেখা যায় না; অথচ এর মধ্যেই রয়েছে এত সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা এবং চমৎকার নিপুণতা। এই মৃত্যু ফলবান শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ ও মুকুলের বর্ধনশীল প্রাণের আকারে প্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- বীজের মৃত্যুর অর্থ হলো উদ্ভিদের নতুন জীবনের সূচনা। তাই এই মৃত্যু প্রাণের মতোই সুবিন্যস্ত একটি সৃষ্টি।

এমনিভাবে মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে জীবন্ত ফল ফলাদি অথবা প্রাণীজ খাদ্যের যেই মৃত্যুতে যা কিছু সৃষ্টি হয় তা আসলেই মানুষের বর্ধনশীল দেহের বিভিন্ন অংশে সেই খাদ্য পৌঁছে যাওয়ার একটি সূচনা ও উৎস হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সেই মৃত্যু সেই খাদ্যের প্রাণের চাইতেও অনেক বেশি সুবিন্যস্ত সৃষ্টি।

উদ্ভিদ তথা প্রাণের স্তরের সবচেয়ে সাধারণ সৃষ্টির মৃত্যু যদি এতটাই হেকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হয় তাহলে

মানুষ তথা সবচেয়ে উন্নত প্রাণীর মৃত্যুতে কেমন হেকমত ও প্রজ্ঞা নিহিত থাকতে পারে? সুতরাং নিঃসন্দেহে মানুষের মৃত্যু আলমে বারজাখে চিরস্থায়ী জীবন দান করে, যেমন মাটির নিচে থাকা বীজ তার মৃত্যু দ্বারা (বায়ুমণ্ডলে) চমৎকার ও রহস্যময়ী উদ্ভিদ হয়ে উত্থিত হয়।

আচ্ছা, তবে মৃত্যু কীভাবে নেয়ামত হয়?

উত্তর : মৃত্যুর অনেক অনেক দিকের মধ্য থেকে মাত্র চারটি দিকের আলোচনা করব।

এক. মৃত্যু মানুষকে পার্থিব জীবনের দায়িত্ব থেকে এবং কষ্টকর জীবন যাপনের জীবিকা থেকে মুক্তি দান করে। মৃত্যু আলমে বারজাখে নিরানব্বই জন প্রিয় বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ও উপায়। অতএব মৃত্যু তাই আল্লাহর মহান এক নেয়ামত।

দুই. মৃত্যু হলো অস্থিরতাপূর্ণ সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ার কারাগারের প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদের তত্ত্বাবধানে প্রবেশ করা এবং তার ব্যাপক রহমতের কোলে স্থান করে নেয়া। মৃত্যু চিরন্তন আলোকময় সুবিশাল জীবনের নেয়ামত যার মধ্যে কোনো ধরনের ভয়ের স্থান নেই এবং যাকে কোনো দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা আচ্ছন্ন করতে পারে না।

তিন. বার্ধক্য এবং জীবনকে কঠিন ও ভোগান্তিকর বানানোর এই ধরনের আরও অনেক কারণগুলো বর্ণনা করে যে, মৃত্যুটা বেঁচে থাকার চাইতেও অনেক বড়ো নেয়ামত। তুমি যদি কল্পনা করো যে, তোমার বাপ-দাদাদের যেই কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তারা যদি বর্তমানে তোমার অতিশয় বৃদ্ধ মা বাবার সাথে তোমার সামনে অবস্থান করতেন তাহলে তুমি বুঝতে যে, জীবন কতটা আজাব ও কষ্টদায়ক আর মৃত্যু কতটা নেয়ামত ও আরামদায়ক। বরং নয়নকাড়া পুষ্পরাজির চমৎকার প্রেমিক কীট যখন শীতকালে জমাট বাঁধা বরফের চাপে পড়ে যায় তখন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তুমি এটা অনুভব করতে পারবে যে, কী পরিমাণ রহমত রয়েছে মৃত্যুর মধ্যে আর কী পরিমাণ কষ্ট রয়েছে বেঁচে থাকার মধ্যে।

চার. যেমনিভাবে ঘুম মানুষের জন্য আরাম ও রহমত, বিশেষ করে বিপন্ন, অসুস্থ ও আহতদের জন্য তেমনিভাবে মৃত্যু -যেটা ঘুমের সদৃশ- মৃত্যুমুখে ঢলে পড়া হতাশাগ্রস্তদের জন্য বিরাট এক নেয়ামত ও রহমত।

আর পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তদের জন্য মৃত্যু তো বেঁচে থাকার মতোই বিরাট এক শাস্তি এবং আজাব আর আজাব যেমনটা আমি বিভিন্ন 'কালিমাতের' মধ্যে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি। এখন এই আলোচনা চলমান আলোচনার বাইরে।

তৃতীয় প্রশ্ন : জাহান্নাম কোথায়?

উত্তর : لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে যে, জাহান্নাম ভূমির নিচে অবস্থিত। অতএব পৃথিবী তার বার্ষিক প্রদক্ষিণ দ্বারা একটি মাঠের রেখা অঙ্কন করে যা ভবিষ্যতে হাশরের মাঠ হবে, যেমনিভাবে আমি এটা আরও বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছি।

জাহান্নাম মাটির নিচে অবস্থিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর বার্ষিক কক্ষপথের নিচে অবস্থিত হওয়া। এবং জাহান্নামকে না দেখা এবং অনুভব করতে না পারার কারণ হলো যে, এটা আলোহীন এবং পর্দাবৃত। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর আবর্তনের কক্ষপথে সেই বিশাল দূরত্ব, যা সৃষ্টিজগৎ থেকে অনেক

অনেক দূরে অবস্থিত এবং দেখা যায় না, এর কারণ হলো তার কোনো নূর ও আলো নেই। অতএব যেমনিভাবে চাঁদের আলোকে যখনই প্রত্যাহার করা হবে তখনই সে তার অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবে তেমনিভাবে অনেক সৃষ্টি ও কাঠামো অন্ধকার হওয়ার কারণে আমরা সেগুলোকে দেখতে পাই না, যদিও সেগুলো আমাদের চোখের সামনে অবস্থিত।

জাহান্নাম দুটি : ছোটো জাহান্নাম এবং বড়ো জাহান্নাম।

ছোটো জাহান্নাম বড়ো জাহান্নামের বীজের মতো। কারণ এই ছোটোটা ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং একটি গৃহে পরিণত হয়ে যাবে।

অর্থাৎ, ছোটো জাহান্নাম পৃথিবীর (অর্থাৎ, ভূমির) নিচে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কারণ পৃথিবীর নিচেই (অর্থাৎ, ভূতলেই) এর কেন্দ্র। আর জানা কথা যে, ভূতাত্ত্বিক স্তরবিদ্যা অনুযায়ী, পৃথিবীতে যখনই তেত্রিশ মিটার খনন করা হয় তখনই (এর) উষ্ণতা -সাধারণত- এক এক ডিগ্রি করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ, উষ্ণতার ডিগ্রি ভূমির কেন্দ্রে দুই লক্ষ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছায়। কেননা, অর্ধেক পৃথিবীর ব্যস ছয়হাজার কিলোমিটার থেকে বেশি অর্থাৎ, এর আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে দুইশ ডিগ্রি বেশি। এটা হাদিসে বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী।

এই ছোটো জাহান্নাম এই দুনিয়াতে এবং আলমে বারজাখে বড়ো জাহান্নামের অনেক দায়িত্ব পালন করছে যেমনিভাবে অনেক হাদিস শরিফ এদিকে ইশারা করে।

আখিরাত জগতের ব্যাপারে আলোচনা হলো পৃথিবী তার বাসিন্দাদেরকে খালি করে দেবে এবং যেই হাশরের মাঠ হবে পৃথিবীর বার্ষিক কক্ষপথের মধ্যে সেই হাশরের মাঠে দুনিয়াবাসীদেরকে ঠেলে দেবে যেমনিভাবে এই পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যেই ছোটো জাহান্নাম রয়েছে তাকে আল্লাহর হুকুমে বড়ো জাহান্নামের দিকে অর্পণ করে দেবে। মুতাযেলাদের কয়েকজন ইমাম বলেন যে, 'জাহান্নাম ভবিষ্যতে সৃষ্টি করা হবে।' এটা ভুল এবং সেই সাথে নির্বুদ্ধিতাও। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সময়ে দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুযায়ী পৃথিবী ব্যাপক প্রসারিত না হওয়ায়। তারপর আমাদের এই দুনিয়াবি চোখ দিয়ে গায়েব ও অদৃশ্যের পর্দায় আবৃত আখিরাত জগতের গৃহগুলোকে দেখা এবং অন্যদেরকে তা দেখানো তখনই সম্ভব হবে যখন পুরো বিশ্বজগৎকে (অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতকে) ছোটো আকারে প্রকাশ করা হবে এবং সেগুলোকে দুটি প্রদেশের মতো বানানো হবে অথবা তখনই দেখা সম্ভব যখন আমাদের চোখগুলোকে তারকারাজির মতো বিরাট আকৃতির বানানো হবে যাতে করে আমরা এর স্থানগুলোকে দেখতে পারি এবং সেগুলোকে নির্ধারণ করতে পারি। অতএব আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট গৃহগুলোকে আমাদের এই দুনিয়াবি চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ

কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতের বিভিন্ন ইশারা থেকে বোঝা যায় যে, আখিরাতের জাহান্নামের সাথে দুনিয়ার জাহান্নামের একটা যোগসূত্র রয়েছে। গীষ্মকালের প্রবল উষ্ণতার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এই উষ্ণতা ও উত্তপ্ততা مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ অতএব বড়ো জাহান্নাম হলো সেই বিশাল অগ্নি যা আমাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র দুর্বল চোখ দিয়ে দেখা যাবে না। কিন্তু আমরা আল্লাহর 'আল-হাকিম' নামের নূর দ্বারা সেটাকে দেখতে পারি। আর তা হলো পৃথিবীর বার্ষিক কক্ষপথের নিচে অবস্থিত বড়ো জাহান্নাম যেন পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত ছোটো জাহান্নামকে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তাই সে তার সেই দায়িত্ব পালন করছে। আর সর্বশক্তিমান কাদিরে জুল জালাল আল্লাহর মালিকানা ও কর্তৃত্ব অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। সুতরাং হেকমতে ইলাহিয়া যেদিকেই জাহান্নামকে অভিমুখী করে সেদিকেই তা স্থির হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, কাদিরে জুল জালাল এবং পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাময় كُنْ فَيَكُونُ নির্দেশের অধিকারী যিনি পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় সুব্যবস্থাপনার সাথে চন্দ্রকে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন যেমনটা প্রত্যক্ষ, যিনি নিজের বিশাল ক্ষমতায় সুব্যবস্থাপনার সাথে পৃথিবীকে সূর্যের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যিনি নিজের মহান রুবুবিয়াত দ্বারা পৃথিবীর বার্ষিক গতির কাছাকাছি গতিতে সূর্যকে তার গ্রহ-উপগ্রহ সহকারে পরিচালিত করেন (এবং) (মেনে নেয়ার ভিত্তিতে) সূর্যকে সকল সূর্যের সূর্যের দিকে পরিচালিত করেন এবং প্রদীপের মতো আলোকোজ্জ্বল তারকারাজিকে তার মহান রুবুবিয়াতের আলোকময় সাক্ষী বানিয়েছেন এবং এর দ্বারা তিনি তার মহান রুবুবিয়াত এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তার কুদরতকে প্রকাশ করেন। এই মহান সর্বশক্তিমান সত্তার পরিপূর্ণ হেকমত ও প্রজ্ঞা, তার মহান কুদরত ও ক্ষমতা এবং তার রুবুবিয়াতের বাদশাহীর পক্ষে এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয় যে, তিনি বড় জাহান্নামকে আলোদানের কারখানার পাত্রের মতো বানাবেন না এবং এর দ্বারা আখিরাতমুখী আসমানের তারকারাজিকে প্রজ্বলিত করবেন না এবং এর উত্তপ্ততা ও তীব্রতা দ্বারা আরও বিস্তৃত করবেন না। অর্থাৎ, তিনি এটাকে জাহান্নামের উত্তপ্ততা ও আগুন দান করবেন এবং -আলোর জগৎ- জান্নাত থেকে এর তারকারাজির দিকে নূর ও আলো প্রেরণ করবেন। আর তখনই জাহান্নাম হয়ে শাস্তিভোগকারীদের জন্য বাসস্থান এবং কারাগার।

এমনিভাবে যেই প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা পাহাড়ের মতো একটি বিরাট বৃক্ষকে সরষের মতো ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে পারেন তার কুদরত ও ক্ষমতা এবং হেকমত ও প্রজ্ঞার জন্য এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি বড়ো জাহান্নামকে ছোটো জাহান্নামের বীজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে পারবেন না যেটা পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত।

এর সারকথা হলো : জান্নাত ও জাহান্নাম হলো সৃষ্টিবৃক্ষের ডালের দুটি ফল। অনন্তকাল পর্যন্ত তা ঝুলন্ত এবং এর ফলের অবস্থানটা হলো ডালের প্রান্তচূড়ায়।

জান্নাত জাহান্নাম হলো এই সৃষ্টিজগতের ধারার দুটি ফলাফল। ফলাফলের স্থান হবে এই ধারার দুই দিকে; এক. এর সম্পূর্ণ নিম্নতম জগৎ, সর্বশেষ পর্যায়ের নিম্নে অবস্থিত; দুই. আলোকময় উর্ধ্বতম জগৎ, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

জান্নাত জাহান্নাম হলো আল্লাহর কার্যাবলির ধারার শেষ (ফলাফল) এবং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ফসলের গোলাঘর ও ভান্ডার। আর গোলাঘর ও ভান্ডারের স্থান হবে ফসলের প্রকার অনুযায়ী; খারাপ ফসলের স্থান হবে পুরোপুরি খারাপ আর ভালো ফসলের স্থান হবে সবচেয়ে উত্তম।

জান্নাত জাহান্নাম হলো অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত বহমান সৃষ্টিরাজির দুটি হাউজ। হাউজের স্থান হবে স্রোতের শান্ত স্থানে এবং তা সব কিছুকে একত্রিত করবে। অর্থাৎ, নোংরা ও খারাপ থাকে সবচেয়ে নিচে আর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি থাকবে সবচেয়ে উপরে।

জান্নাত জাহান্নাম হলো করুণা ও কঠোরতা এবং দয়া ও মহত্বের তাজাল্লির দুটি স্থান। আর তাজাল্লির স্থান যে কোনো জায়গায় হবে। রহমানুল জামিল (চিরসৌন্দর্যময় অসীম দয়ালু) এবং কাহহারুল জালিল (মহামহিম প্রতাপশালী) তার তাজাল্লির স্থান যেখানে ইচ্ছা সেখানে উন্মুক্ত করবেন।

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব-বিষয়ক আলোচনাকে '১০ম কালিমা", '২৮তম কালিমা' এবং '২৯তম কালিমা"য় অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। তবে এখানে এটুকুই বলব যে :

ফলের অস্তিত্ব অকাট্য ও সুনিশ্চিত যেমন ডালের অস্তিত্ব অকাট্য ও সুনিশ্চিত... ফলাফলের অস্তিত্ব

সুনিশ্চিত যেমন-

ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত... ভান্ডারের অস্তিত্ব যেমন ফসলের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত... হাউজের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত যেমন নদীর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত... তাজাল্লির স্থানের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত যেমন রহমত ও দয়া এবং রাগ ও কঠোরতার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।

চতুর্থ প্রশ্ন : প্রেমাস্পদের প্রতি রূপক ও কৃত্রিম ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে। তাহলে কি অধিকাংশ মানুষের অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি রূপক ও কৃত্রিম ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চেহারার প্রতি আসক্ত রূপক প্রেমিক যখন এর চেহারায় বিনাশের কুশ্রীতা ও ধ্বংসের বীভৎস আকৃতি দেখতে পায় তখন সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদকে অনুসন্ধান করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়ার দুটি সুন্দর মুখ তথা আসমাউল হুসনার আয়না এবং আখিরাতের ফসলের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর তাওফিক দান করে। তখনই শরিয়ত অসমর্থিত রূপক ও কৃত্রিম ভালোবাসা ও আসক্তি প্রকৃত ভালোবাসা ও আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হলো তার জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বাহ্যিক দুনিয়ার সাথে মিলাতে পারবে না। কারণ সে যদি পথভ্রষ্ট ও উদাসীনদের মতো নিজেকে ভুলে যায় এবং দুনিয়ার মোহে ডুবে যায় এবং তার বিশেষ দুনিয়াকে ব্যাপক দুনিয়ার মতো মনে হয় তাহলে সে এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। তখন সে প্রকৃতির আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে এবং নিমজ্জিত হবে। তবে আল্লাহর রহমত যাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করে তার কথা ভিন্ন।

নিম্নের একটি উপমার মধ্যে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো যা তোমার নিকট এই হাকিকত ও বাস্তবতাকে আরও সুস্পষ্ট করবে :

মনে কর, আমরা চারজন একটি রুমের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এর চারটি দেয়ালের মধ্যে পুরো দেয়ালজুড়েই রয়েছে অনেক বড়ো বড়ো আয়না ও গ্লাস। তখন সেই চমৎকার একটি রুম পাঁচটি রুমে পরিণত হয়ে যাবে। একটি রুম বাস্তব ও সার্বজনীন আর বাকি চারটি রুমই হবে সাদৃশ্যপূর্ণ ও নিজস্ব। আমাদের প্রত্যেকেই তার আয়নার মাধ্যমে তার বিশেষ রুমের আকৃতি, গঠন ও রং পরিবর্তন করতে পারে। আমরা যদি সেই রুমটিতে লাল রং করে দেই তাহলে সেই রুমটিকে লাল দেখা যাবে। আমরা যদি সবুজ রং মেরে দেই তাহলে সেটাকে সবুজ দেখা যাবে। এভাবেই বাকি রুমগুলোর অবস্থা হবে...। আমরা আয়নার মধ্যে পরিবর্তন ও হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে রুমটিকে বিভিন্ন ধরনের বানাতে পারি। বরং আমরা চাইলে অনেক সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন বানাতে পারি আবার চাইলে কুশ্রী ও বিশ্রীও বানাতে পারি। অথবা আমরা যেই আকৃতিরই বানাতে চাই বানাতে পারব। কিন্তু আমরা চাইলে খুব সহজেই আয়নার বাইরে সার্বজনীন রুমটিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারব না। অতএব দুটি নিজস্ব ও সর্বজনীন রুমের বিধান ভিন্ন রকমের, যদিও সেগুলো বাস্তবে একটিই। অতএব তুমি আঙ্গুল নড়াচড়া করে তোমার রুমটিকে ধ্বংস করতে পার পক্ষান্তরে সেই সার্বজনীন রুমটির একটি অংশকে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন করতে পার না।

দুনিয়ার বিষয়টিও এমনই। এই দুনিয়া সুন্দর সুসজ্জিত একটি বাড়ি। আমাদের প্রত্যেকের জীবন হলো সুবিস্তৃত বড়ো একটি আয়না। আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওই ব্যাপক ও সার্বজনীন দুনিয়া থেকে একটি বিশেষ ও নিজস্ব দুনিয়া। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে তার বিশেষ ও নিজস্ব জগৎ। তবে

আমাদের দুনিয়ার ভিত্তি, কেন্দ্র ও দরজা হলো আমাদের জীবন। বরং আমাদের নিজস্ব দুনিয়া ও জগৎ হলো একটি (কাগজের) পাতা, আমাদের জীবন হলো একটি কলম। এই কলমের মাধ্যমে অনেক কিছু লেখা যায় যেগুলো আমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা যদি আমাদের দুনিয়াকে ভালোবাসি তারপর আমরা দেখি যে, এই দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, আমাদের জীবনের মতো এর কোনো স্থায়িত্ব নেই -কারণ আমাদের জীবন তো এই দুনিয়াতেই স্থাপিত- এবং এই ক্ষণস্থায়িত্বকে অনুভব করি ও উপলব্ধি করি তাহলে দুনিয়ার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আসমাউল হুসনার নকশার ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে যেই নকশাগুলো আমাদের নিজস্ব দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। তাহলেই ভালোবাসা আসমাউল হুসনার তাজাল্লির ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

তারপর আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, আমাদের নিজস্ব দুনিয়া আখিরাত ও জান্নাতের সাময়িক একটি ক্ষেত ও ফসলক্ষেত্র এবং এর প্রতি আমাদের প্রবল অনুভূতি ও সুদৃঢ় অনুভব যেমন লোভ, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, ভালোবাসা এবং এই ধরনের আরও অন্যান্যগুলোকে সেই ক্ষেতের ফলাফলের দিকে, ফসলের দিকে এবং শিষের দিকে পরিবর্তন করি যেগুলো তার আখিরাতের ফায়েদা ও উপকারিতা, তাহলে তখনই সেই রূপক ও কৃত্রিম ভালোবাস প্রকৃত ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

সুতরাং ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভুলে গিয়ে এবং এই দুনিয়াতে নিজেকে চিরস্থায়ী ভেবে যে নিজেকে ভুলে যায়, নিজের সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না এবং নিজের সাময়িক ক্ষণস্থায়ী নিজস্ব দুনিয়াকে ব্যাপক সর্বজনীন দুনিয়ার মতো মনে করে, তারপর নিজের সকল অনুভব অনুভূতি দিয়ে এই পৃথিবীকে আকড়ে ধরে, সে এই দুনিয়াতেই নিমগ্ন হয়ে যায় এবং তার সবকিছু এখানেই শেষ হয়ে যায়। ফলে সেই ভালোবাসা তার জন্য কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পরিণত হয়ে যায়। কেননা, সেই ভালোবাসা এতিমের মতো হতাশাপূর্ণ অন্তরের ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে সে প্রাণীদের বিভিন্ন অবস্থা থেকে যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে যে, সে ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অনুভব করে; যার কারণে সে সকল সুন্দর সৃষ্টিজীবের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে যায়; যে কারণে তাকে ধ্বংস ও বিচ্ছেদের চপেটাঘাত খেতে হয়। আর সে নিজেকে এগুলোর সামনে কর্তিত হাতের মতো মনে করে। ফলে তিক্ত হতাশায় নিপতিত হয়ে যন্ত্রনা ঢোঁক গিলতে থাকে।

যেই প্রথম ব্যক্তি উদাসীনতার ফাঁদ থেকে মুক্তি লাভ করেছে, সে সহানুভূতি ও ভালোবাসার সেই তীব্র যন্ত্রণার সময়ে আরোগ্যদানকারী প্রতিষেধক পেয়ে যায়। কারণ, সে প্রাণীদের মৃত্যুর মধ্যে এবং যারা নিজেদের পরিস্থিতিতে কষ্ট ভোগ করে, তাদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাদের রুহের আয়নাগুলোকে স্থায়ী হতে দেখতে পায়- যেই আয়নাগুলো চিরস্থায়ী শাশ্বত সুমহান সত্তার চিরন্তন নামের চিরন্তন তাজাল্লির প্রতিনিধিত্ব করে। আর তখনই তার সহানুভূতি ও ভালোবাসা চিরস্থায়ী আনন্দে পরিণত হয় এবং ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পথে আবর্তিত সমস্ত সুন্দর সৃষ্টির পশ্চাতে একটি সুনিপুণ নকশা, অভিনব সৌন্দর্য, সাজসজ্জা, দয়া ও অনুগ্রহ এবং চিরন্তন আলো দেখতে পায়- যা তাকে নিষ্কলুষ শোভা ও পবিত্র সৌন্দর্য দ্বারা অনুভব করায়; এমনকি সে ওই ধ্বংস ও বিনাশকে মনে করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি, স্বাদের নতুনত্ব এবং সৃষ্টিকর্মের পরিচিতি প্রদানের একটি ধরন- যা তার স্বাদ ও আনন্দ এবং আগ্রহ ও বিস্ময়কে

আরও বাড়িয়ে তুলবে।

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

সাঈদ নুরসি

***

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

দ্বিতীয় মাকতুব

[উল্লেখিত ও পরিচিত তালাবার নিকট থেকে আসা হাদিয়া সম্পর্কে উদ্ধৃতির একাংশ]

আমাকে একটি হাদিয়া (উপহার) পাঠিয়েছ। খুবই গুরুত্বর্পূণ আমার একটি নীতিকে ভেঙে ফেলতে চাচ্ছ। আমি বলছি না যে 'আমার ভাই ও ভাইপো আবদুল মাজিদ ও আবদুর রাহমানের নিকট থেকে যেভাবে হাদিয়া গ্রহণ করিনি, সেভাবে তোমার নিকট থেকেও গ্রহণ করব না।' কারণ, তুমি তাদের থেকেও অগ্রসর ও আমার রুহের আরও কাছাকাছি হওয়ায় সবার হাদিয়া গ্রহণ না করলেও একটি বারের জন্য তোমার হাদিয়াকে না করা সঠিক হবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার নীতির গভীর তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করব। তা হলো-

পুরাতন সাঈদ করুণা গ্রহণ করত না। করুণা গ্রহণ করা চেয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করা শ্রেয়তর মনে করত। গভীর কষ্ট ও পীড়াতে ভুগলেও নীতিকে বিসর্জন দেয়নি। পুরাতন সাঈদের নিকট থেকে তোমার এই ভাইয়ের নিকট যে নীতিটি মিরাস হিসেবে চলে এসেছে- তা নিছক লোক দেখানো ও কৃত্রিম কোনো অমুখাপেক্ষিতা নয়; বরং এর পেছনে চার-পাঁচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ : পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিতরা (আহলে দালালাত) জীবিকা নির্বাহের বাহন বানাচ্ছে বলে আলিমগণকে দোষারোপ করছে। 'ইলম ও দ্বীনকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহার করছে' বলে ইনসাফহীনতার সাথে তাদের আক্রমণ করছে। এগুলোকে বাস্তবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা দরকার।

দ্বিতীয় কারণ : সত্যের প্রচার ও প্রশারের জন্য আম্বিয়াদের অনুসরন করতে আমরা বাধ্য। কুরআন-ই হাকিমে সত্যের প্রচারকারীগণ

اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ * اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ

বলার মধ্য দিয়ে মানুষের নিকট নিজের অমুখাপেক্ষিতাকে তুলে ধরেছেন। সূরা ইয়াসিনে বিদ্যমান- اِتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْئَلُکُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ আয়াতাংশ আমাদের বিষয়ের জন্য অতি অর্থবহ।

তৃতীয় কারণ : প্রথম বাণীতে যেভাবে বলা হয়েছে- সেই অনুযায়ী আল্লাহর নামে দেওয়া, আল্লাহর নামে নেওয়া প্রয়োজন। অথচ অধিকাংশ প্রদানকারী হয় গাফিল, নিজ নামে দেয়, মনে মনে কৃতজ্ঞতা চায় অথবা গ্রহণকারী গাফিল, মুমিন-ই হাকিকির প্রাপ্য শুকরিয়া ও প্রশংসাকে বাহ্যিক উসিলাসমূহকে প্রদান করে ভুল করে।

চতুর্থ কারণ : তাওয়াক্কুল, তুষ্টতা ও মিতব্যায়িতা এমন এক ভান্ডার ও সম্পদ, যা কোনো কিছুর সাথে বিনিময় করা যায় না। মানুষের নিকট থেকে মাল সংগ্রহ ও সঞ্চিত করে ওই নিঃশেষ না হয়ে যাওয়া ভান্ডার ও খনিসমূহকে হারাতে চাই না।

রাজ্জাক-ই জুল জালালের নিকট কোটি কোটি শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে ছোটো কাল থেকেই করুণা ও নীচুতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ইহসানের ওপর ভরসা করে বাকি জীবনটুকু ওই নীতি অনুসারে অতিবাহিত করতে পারার জন্য তাঁর (রহমতের) নিকট প্রার্থনা করছি।

পঞ্চম কারণ : গত দুই এক বছরের বিভিন্ন আলামত ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার মাঝে গভীর এক বিশ্বাস জন্মেছে যে, জনসাধারণের কোনো মাল বিশেষত ধনীদের ও কর্মচারীদের উপহার বা হাদিয়া সমূহ গ্রহণ করার অনুমতি আমার নেই। এগুলোর মাঝ থেকে কোনো কোনোটি আমাকে অসুস্থ করে তুলছে। এটা সুনির্দিষ্ট যে, এগুলোকে আমার জন্য অসুস্থতার কারণ করা হচ্ছে। আমাকে ভক্ষণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কখনও কখনও এগুলোকে আমার জন্য ক্ষতিকর করে তোলা হচ্ছে।

সুতরাং এই অবস্থা অন্যের মাল গ্রহণ না করার জন্য একধরনের নির্দেশ এবং বিধি-নিষেধ।

আমার মাঝে একাকী থাকার মানসিকতা রয়েছে। সবাইকে সব সময় গ্রহণ করতে পারি না। জনগণের উপহারকে গ্রহণ করার অর্থ সময়ে অসময়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের খাতির-যত্ন করা- যা আমার পছন্দনীয় নয়। অধিকন্তু কৃত্রিমতা ও নীচুতা থেকে আমাকে উদ্ধারকারী এক টুকরা শুকনা রুটি আহার করা, শত তালি লাগানো পোশাক পরা আমার নিকট পছন্দনীয়। অন্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বাকলাভা খাওয়া, অতি সুসজ্জিত পোশাক পরা এবং তাদের ইচ্ছাকে পূরণ করতে বাধ্য হওয়া আমার নিকট সুখকর নয়।

ষষ্ঠ কারণ : অমুখাপেক্ষিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো- আমাদের মাজহাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আলিম ইবনে হাজর বলেছেন, সালাহাত বা দ্বীনদারিত্বের নিয়তে তোমাকে প্রদও কিছু তুমি সালেহ্ না হলে গ্রহণ করা হারাম। এই জামানার মানুষগুলো লোভ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে ছোটো একটি উপহার বা হাদিয়াকে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রি করছে। আমার মতো গুনাহগার এক উপায়হীনকে দ্বীনদার ওলি মনে করে একটা রুটি দিচ্ছে। কখনও না! যদি আমি নিজেকে সালেহ্ বা দ্বীনদার মনে করি, তাহলে তা অহংকারের লক্ষণ এবং দ্বীনদারিত্বের অনুপস্থিতির প্রমাণ। যদি নিজেকে দ্বীনদার মনে না করি, তাহলে ওই মাল গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অধিকন্তু আখিরাত কেন্দ্রিক আমলের বিপরীতে সাদাকা ও উপহার গ্রহণ আখিরাতের স্থায়ী ফলগুলোকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে ভক্ষণের সামিল।

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

সাঈদ নুরসি

***

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

তৃতীয় মাকতুব

[যেই পত্র তিনি তাঁর পরিচিত ছাত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রের একটি অংশ]

পঞ্চমত : তুমি তোমার কোনো একটি পত্রের মধ্যে লিখেছিলে যে, তুমি এখানে আমার যেই অনুভব ও অনুভূতি হচ্ছে, সেসব বিষয়ে তুমি আমার অংশীদার হতে চাচ্ছ। তাহলে শোনো, এখানকার হাজার অনুভূতির একটি :

কোনো এক রাতে আমি 'চাম' পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় 'কাতরান' বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় অবস্থিত একটি মাচায় ছিলাম। সেখান থেকে আমি তারার প্রদীপে উজ্জ্বল চমৎকার সুশোভিত আসমানের অভিমুখী হলাম। দেখলাম,

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ

এই আয়াতে উল্লিখিত কসম ও শপথের মধ্যে ইজায ও মুজিযার সুমহান একটি নূর রয়েছে। আমি এর মধ্যে কুরআনে হাকিমের ও অলংকারশাস্ত্রের সমুজ্জ্বল সাহিত্যপূর্ণ একটি রহস্য দেখলাম।

হ্যাঁ, এই আয়াতে কারিমা গতিময় তারকারাজির দিকে, সেগুলোর আত্মগোপন হওয়ার দিকে এবং সেগুলোর বিস্তৃত হওয়ার দিকে ইশারা করে। এই আয়াতে কারিমা দর্শকের সম্মুখে আসমানের সুনিপুণ কারুকার্যময় নকশাকে সামনে উপস্থিত করে এবং এমন একটি চমৎকার ফলক অঙ্কন করে- যা শিক্ষা ও জ্ঞানের ভান্ডার দান করে।

হ্যাঁ, এই চলমান নক্ষত্রগুলো যখনই তার সৌরজগৎ থেকে বের হয়ে সুস্থির তারকাদের সীমানায় প্রবেশ করে, তখনই সেগুলো আসমানের পৃষ্ঠভাগে নতুন নতুন চমৎকার নকশায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং একেক সময়ে একেক রকম নিপুণতা সৃষ্টি করে। পরস্পরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে হয়ে থাকে এবং সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট একটি নিদর্শন প্রকাশ করে। কিছু কিছু তারকা ছোটো ছোটো নক্ষত্রগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তারপর সেগুলো ছোটো ছোটো তারকাগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে দিগন্তে সমুজ্জ্ব শুকতারা (শুক্রগ্রহ) এই মৌসুমে সূর্যাস্তের পর তার সহ-বিচরণশীল তারকাগুলোর সাথে ফজরের পূর্বে সমুজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কী সৌন্দর্যই না এই দিগন্তে ফুটে ওঠে!

প্রত্যেক তারকা নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করার পরে, অন্যদেরকে তত্ত্বাবধান করার পরে এবং সৃষ্টিকর্মের চমৎকার নকশার বুননের মতো নিজেদের কাজগুলো শেষ করার পরে সবগুলো এসে তার মহান বাদশাহ তথা সূর্যের সীমানায় এসে পড়ে তারপর আলোয় ঢেকে পড়ে, আড়াল হয়ে যায় এবং দৃষ্টিসীমা থেকে গোপন হয়ে যায়।

এই যেই চলমান নক্ষত্রগুলোকে কুরআনুল কারিমা 'اَلْ خُنَّسِ' (আলখুন্নাস) 'اَلْ كُنَّسِ' (আলকুন্নাস) বলে ব্যক্ত করেছে- সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই পৃথিবীর সাথে এমনভাবে চলমান করেছেন; যেমন বিশ্বজগতের জাহাজ সৃষ্টিজগতের ঢেউ ভেঙে অবিরাম চলছে এবং তিনি জগতের